কৃষি উৎপাদনে নারী

সৌজন্যে ঃ দৈনিক প্রথম আলো

পূর্বকথা ঃ

ইতিহাসবিদ ও পন্ডিতদের মতে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে পশ্চিম এশিয়ার কোন এক স্থানে কৃষিভিত্তিক সমাজের উদ্ভব ঘটেছিল। বরফ যুগের অবসানে এশিয়া-ইউরোপের বরফাস্তীর্ণ সমভূমিতে যেমন বনভূমির সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছিল। কোথাও কোথাও তৃণভূমি পরিণত হয়েছিল মরু অঞ্চলে। যদিও মরুভূমিতে মরুদ্যান এবং নদী-তীরবর্তী উর্বর ভূমিও ছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এসব স্থানের জঙ্গল ও জলা ভূমিতে এসে জড়ো হয় অংশ পাশের সকল জীব-জানোয়ার ও শিকারী মানুষেরা।

আদিমতম মানুষেরা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল এবং তারা নারী-পুরুষ সবাই মিলে একসাথে খাবার সংগ্রহ করত। তবে শিকারের জন্য পুরুষেরা দূরদুরান্তে গেলেও নারীরা আস্তানার কাছে পিঠের জীব জানোয়ার শিকারের পাশাপাশি ফলমুল, লতাপাতা, ঘাসের বীচি সংগ্রহ করত। সংগৃহীত বুনো ঘাসের বীজ (আজকের যব, গম, ধান প্রভৃতির পূর্বপুরুষ) থেকেই নারীর হাত দিয়ে কৃষি কাজের আবিষ্কার ঘটে।

ইতিহাসে দেখা যায় প্রাচীন যুগে (নতুন পাথরের যুগ) কৃষি বিপ্লব সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নারী কেবল উপযুক্ত শস্য এবং চাষ পদ্ধতিই আবিষ্কার করেনি পাশাপাশি জমি চাষ, শস্য কাটার যন্ত্র, শস্য থেকে খাদ্য তৈরির পদ্ধতি, সারা বছর ধরে শস্য জমা রাখার ব্যবস্থা, কুমোরের চাক, চাকা, মাটির পাত্র ইত্যাদি তৈরীর কৌশল নারীরাই আবিষ্কার করেছিল [মানুষের ইতিহাস- (প্রাচীন যুগ) আব্দুল হালিম ও নূরুন নাহার বেগম]

সৃষ্টির আদি পেশা এই কৃষি কাজের সূচনা হয় যেমন নারীর হাত দিয়ে তেমনি প্রথম কৃষি সমাজও গড়ে উঠে নারীর নেতৃত্বেই। ফলশ্রুতিতে মানব সভ্যতার ইতিহাসে নবযুগের উন্মেষ ঘটে। সেই প্রচীন কালের গিরি-গুহা থেকে

উপত্যকায়-সমতলে নেমে আসা নারী আজও বিশেষ করে বাংলাদেশে বপন, রোপন, নিড়ানিসহ ফসল পরিচর্যার সকল স্ত র এবং তা ঘরে তোলা পর্যন্ত সব কিছুই করছে।

পেশার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটলেও শ্রমশক্তি জরীপ অনুযায়ী বিভিন্ন পেশার পাশাপাশি কৃষি ক্ষেত্রেও নারী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী গত এক দশকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নিমিত্তে (১,৩০,০০০০০) এক কোটি ৩০ লক্ষ বাড়তি শ্রমশক্তি যুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষই নারী শ্রমিক। এই বাড়তি নারী শ্রমিকের প্রায় ৭৭ ভাগই কৃষি শ্রমিক।

বাংলাদেশে কৃষির গুরুত্ব ঃ

গ্রাম প্রধান বাংলাদেশে কৃষিই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি। কৃষির অগ্রগতির সাথে এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এছাড়া দারিদ্র বিমোচন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, কৃষি নির্ভর শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই কৃষিখাতের অগ্রগতির প্রত্যক্ষ যোগসূত্র বিদ্যমান। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থ বছরে জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ২০.০১ শতাংশ।

বিগত তিন দশকে গ্রামীন অর্থনীতি এখন অনেক বৈচিত্রময় ও গতিশীল। চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদনসহ কৃষিতে কর্পোরেট উপস্থিতি আজ স্পষ্ট দৃশ্যমান। অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর মত বাংলাদেশেও সুপার মার্কেটের উত্থান কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন কৃষি ও গ্রামীন জীবনকে দিচ্ছে গতি। সুতরাং দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি ও কৃষি নির্ভর শিল্পে কর্মসংস্থান এবং কৃষি থেকে কৃষকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে কৃষির ভূমিকা সর্বাধিক।

বাংলাদেশের কৃষিতে নারীর অবদান ঃ

১৯৯৫-৯৬ সালের শ্রম জরিপে নারী যে কৃষক এবং কৃষিকাজ করে তা প্রথম বিবেচনা করা হয়েছে। জরিপে গৃহপালিত পশু, হাঁস-মুরগীর খামার, ধান ভানা, সিদ্ধ করা, শুকানো, ঝাড়া, প্রক্রিয়াজাত করণ, খাদ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্রমাঞ্চলে নারীরাই এ কাজগুলো করে থাকে। এগুলোর বাইরে আরো অনেক কাজ আছে যা অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে বিবেচিত হয়না। এই স্বীকৃতি হীনতার জন্য রাষ্ট্রীয় সকল কৃষি পরিকল্পনার টার্গেট হয় পুরুষ। কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, কৃষক কার্ড, ঋণ সুবিধা সবই পায় কৃষক। নারী কৃষক সকল ধরণের রাষ্ট্রীয় সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়।

শ্রমশক্তি জরিপ ২০০৫-০৬ অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৫ বছরের ওপরের জনশক্তির ৪৮.১ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত। এই জরিপ অনুসারে শ্রমশক্তির ৪১.৮ শতাংশ পুরুষ এবং ৬৮.১ শতাংশ নারী সরাসরি কৃষির সাথে যুক্ত। অর্থাৎ কৃষি কেবলমাত্র কর্মসংস্থানের বৃহত্তম ক্ষেত্রই নয়, নারীর অংশগ্রহণ ও সামাজিক গতিশীলতারও প্রধানতম এলাকা। গত এক দশকে কৃষিখাতে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ১০.৪ শতাংশ, সেই ছেড়ে যাওয়া কাজের খাতগুলি কিন্তু অব্যবহৃত পড়ে থাকেনি সেই শূণ্যস্থান পুরণ করেছে নারী কৃষি শ্রমিকেরা।

প্রাচীনকাল থেকেই পরিবার সুসংহত রাখা ও খাদ্য যোগাতে নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আদিম সমাজে মোট খাদ্য সংগ্রহ হতো দু'ভাবে।

১। আহরণের মাধ্যমে ৮০ ভাগ এবং

২। শিকারের মাধ্যমে ২০ ভাগ। আহরণের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহের পুরো কাজ করত নারী। উপরন্তু শিকারেও অংশ নিত।

✯ বর্তমানে নারী শ্রমশক্তির ৬৮ শতাংশই কৃষি, বনায়ন ও মৎস খাতের সংগে জড়িত।

✯ ১৪২ টি হর্টিকালচার বা উদ্যান ফসলের অর্ধেকে অবদান রাখছে নারী কৃষক ও শ্রমিক

✯ ফসল উৎপাদনে নারীর সক্রিয় অবদান ২৭ ভাগ।

✯ সার হিসেবে ছাই ব্যবহার, জাবড়া (বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ দিয়ে মাটির উপরিভাগ ঢেকে মাটির উর্বরতা রক্ষার কৌশল) দেয়া, দুটি ফসলের অন্তবর্তীকালীন জামি পতিত রাখা, শস্যচক্র, পাহাড়ের গা কেটে আবাদ করা - সবই নারীর অবদান।

✯ গত এক দশকে কৃষি, বন, মৎস চাষ, পশু পালন ও হাঁস মুরগি পালন প্রভৃতি কৃষিজাত কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৩৭ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৮০ লক্ষ হয়েছে।

✯ ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, কৃষি খাতে নিয়োজিত পুরুষের চেয়ে নারীর অবদান শতকরা ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ বেশি।

✯ এক জরিপে দেখা যায়, কর্মক্ষম নারীদের মধ্যে কৃষি কাজেই সর্বাধিক নারী নিয়োজিত। ফসলের প্রাক বপন থেকে শুরু করে, ফসল উত্তোলন, বীজ সংরক্ষণ পর্যন্ত কৃষি কাজের ২১টি কাজের ধাপের মধ্যে ১৭টি ধাপেই নারীর অংশগ্রহণ বিদ্যমান।

✯ কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী ঃ

গত এক যুগে দেশে মাথাপিছু সবজির ভোগ বেড়েছে	-	২৫ শতাংশ।
গত এক বছরে সবজি রপ্তানিতে আয় বেড়েছে	-	৩৪ শতাংশ।
দেশে সবজি বীজ উৎপাদিত হচ্ছে	-	৯০ শতাংশ।
কৃষিজাত খাদ্যের রপ্তানি বেড়েছে	-	৬০ শতাংশ।

বর্তমানে এক কোটি ৬২ লাখ কৃষক পরিবারে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা জমির পাশের উঁচু স্থানে, আইল, বাড়ির উঠান, টিনের চালাতেও সবজি চাষ করে সবজি উৎপাদন বাড়িয়েছে ৫ গুন।

বাংলাদেশে চাষের জমি হ্রাস পেলেও বিশ্বে সবচেয়ে বেশি হারে সবজির আবাদি জমির পরিমান বেড়েছে বাংলাদেশে, বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ।

নেপালে বৃদ্ধির হার ৪.৯ শতাংশ এবং

সিরিয়ায় বইদ্ধর হার ৪.৩ শতাংশ। (উৎস ঃ প্রথম আলো ১৪/১১/২০১৪)

এভাবে ফলবাগান, বাড়ি ও রাস্তার পাশের উঁচু গাছের মধ্যে মাচা করে সবজি চাষে নারীরাও পুরুষের পাশাপাশি সফলতার অংশীদার।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গেছে, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষি পরিবারের নারীরা নিজ উদ্যোগে বসতবাড়ির আঙিনায় বাগানে ফলানো সবজি পরিবারের চাহিদার ৯০ - ১০০ ভাগ মেটানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত আয়ে অবদান রাখছে ১৫ থেকে ৩০ ভাগ।

বিশ্বের অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও নারীরা পরিবেশ বান্ধব। পরিবেশগত পরিবর্তন কর্মসূচীর মাধ্যমে নারীরা একত্রিত হয়ে পরিকল্পনা মাফিক বৃক্ষরোপন, বনায়ন, ভূমি সংরক্ষণ, সবজি চাষ, ফল চাষ, ভেজষ বৃক্ষরোপন, জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ইত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের কার্যক্রমেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জাতিসংঘের বন ও পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে গঠিত The Collaborative Partnership of Forest (CPE) কেনিয়ার নোবেল বিজয়ী পরিবেশবিদ ওয়াংগারি মাথাইয়ের নামে পুরস্কার চালু করেছে। পরিবেশ ও বণ সংরক্ষণ কাজ করা নারীদের এ পুরস্কার দেয়া হয়। ২০১২ সালে বাংলাদেশের কক্সবাজারের খুরশিদা বেগম বেগম ওয়াংগারি মাথাই পুরস্কারটি অর্জন করেন।

আমাদের দেশে সাধারণত ঃ কৃষক পরিবারের নারীরা ফসল মাড়াই, ঝাড়া-বাছাই, শুকানো কাজের অন্তত : ৯৫ ভাগই করে থাকে। বসত বাড়ির পশু সম্পদ, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল লালন পালনসহ যাবতীয় কাজ, গোয়াল ঘর পরিস্কার, গবাদি পশুকে খাওয়ানো ও পরিচর্যা ইত্যাদি কাজগুলো নারীরাই করে থাকে।

১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা আয়োজিত বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "অন্ন যোগায় নারী।" এ উদ্যোগটি কৃষিতে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দেবার জন্যই নেয়া হয়েছিল। এদেশে অদ্যাবধি সভা, সেমিনারে নারীর কাজের স্বীকৃতি মিললেও দেশের সার্বিক বাস্তব চিত্র ভিন্ন। এখানে নারী ও পুরুষের মজুরীতে ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান। সর্বোপরি কৃষক হিসেবে নারীর কোন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও মেলেনি। যদিও ২০১১ এর নারী নীতির ক্রমিক নং-৩১.১ এ বলা হয়েছে জাতীয় অর্থনীতিতে নারী কৃষি শ্রমিকের শ্রমের স্বীকৃতি দিতে হবে। এবং বাংলাদেশ সরকার ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ নীতিকে সরকারের অনুসরনীয় নীতি বলে ঘোষণা দিয়েছে।

কৃষিতে নারীর বর্তমান অবস্থান ঃ

দেশের কৃষি খাতে নারীর ব্যাপক অবদান থাকলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের স্বীকৃতি নেই। গত এক দশকে অবৈতনিক কার্যক্রমের সংগে যুক্ত প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ বাড়তি শ্রমশক্তির ৫০ লক্ষই নারী। যাদের ৭৭ শতাংশই কৃষি কাজে নিয়োজিত। বর্তমানে দেশে কৃষি, মৎস চাষ, বন, পশুপালন ও হাঁস-মুরগি পালন প্রভৃতি কৃষিজাত কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৩৭ লক্ষ থেকে বেড়ে বর্তমানে ৮০ লক্ষ হয়েছে। এ বৃদ্ধির হার ২১৬ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অবৈতনিক পারিবারিক কাজের পাশাপাশি ৭৭ শতাংশ গ্রামীন নারী কৃষি সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত থেকে পুরুষের সংগে পাল্লা দিয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজ করে। জমি তৈরি থেকে শুরু করে ফসল ক্রেতার ঘরে যাওয়া পর্যন্ত কৃষি

খাতের ২১টি কাজের মধ্যে ১৭টি ধাপেই নারী অংশগ্রহণ করলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের গুরুত্ব দেয়া হয়নি। কৃষি অর্থনীতিতে নারীর অবদানকে হিসেব করা হয়না কারণ সরকারের নীতি কৌশলের সাথে এর যোগসূত্র এখনও স্থাপন হয়নি। তাই রাষ্ট্রীয় প্রণোদনার অংশ হিসেবে ১ কোটি ৩৯ লাখ কৃষক কার্ড বিতরণ হলেও তৃণমূলে 'কিষাণী কার্ড' বিতরণ প্রায় অনুল্লেখ্য। রাষ্ট্র প্রদত্ত শক্তিশালী কৃষি সম্প্রসারণ সেবা, বীজ বপন, চারা রোপন, নিড়ানিসহ ফসল পরিচর্যা থেকে ঘরে তোলা পর্যন্ত কাজে নিয়োজিত কিষানীরা পাচ্ছেনা। কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি না পেলে কৃষি বীমা পাওয়ার সরকারি সুবিধাও কিষানীরা পাবেনা।

উপরন্তু পুরুষের সমান কাজ করে নারীরা মজুরী বৈষম্যের শিকার। তাদের মজুরী কম। নড়াইলের চাল কলের রোজিনা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে পায় ১০০ টাকা। যেখানে একজন পুরুষ শ্রমিক পায় ১৪০ টাকা।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার চৌধুরী হাটের রওশন বেগম বলেন, 'সকাল নয়টার সময় সবাই একসংগে কাজ শুরু করি। পুরুষেরা মাঝে মধ্যে পান, চা-বিড়ি খাওয়ার নামকরে বিশ্রাম নেয়। কিন্তু আমরা কাজ করেই যাই। কিন্তু পুরুষেরা পায় ২২০ থেকে ২৫০ টাকা। আর আমরা পাই ১৮০ থেকে ২০০ টাকা।'

ফরিদপুর সদর উপজেলার আলিয়াবাদ ইউনিয়নের কিষাণী রেহানা বেগম বলেন, 'আমরা নারীরা ক্ষেতে ও বাড়িতে কৃষির সকল কাজগুলো করে থাকি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করি। কিন্তু আমাদের সমাজের ও বাড়ির লোকেরা মনে করে কাজ আমাকে করতে হবে এর আবার স্বীকৃতি কিসের। তারা মুখেও স্বীকার করতে চায়না যে, নারীরা অনেক কাজ করে।'

ঈশ্বরদির (পাবনা) ধানের চাতালে পুরুষ চাতাল শ্রমিকদের এক চাতাল বা একদাগ হিসেবে পারিশ্রমিক দেয়া হয় ৮০০ টাকা। কিন্তু নারী শ্রমিকদের কোন টাকা দেয়া হয়না। এক দাগ হিসাবে তারা জনপ্রতি ১৪ কেজি খুদ ও ১৪ কেজি ধানের কুঁড়া পারিশ্রমিক হিসেবে পায় যার বাজার মূল্য ৪৪০ টাকা।

টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত পারিবারিক অবৈতনিক শ্রম দেয়া নারীদের এবং মাঠে-ঘাঠে কাজ করা নারীদের চালচিত্র প্রায় একই। সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার বরাবরই অনুচ্চারিত ও অমীমাংসিত। উৎপাদন উপকরণ সমূহের উপর উৎপাদকদের (নারী কৃষক/কিষানী) অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রীয় প্রনোদনা জরুরী। কৃষিজমি প্রস্তুতকরণ, সার-সেচ ব্যবহারে বিনিয়োগ সামর্থ কম থাকায় দরিদ্র কিষাণীকে 'কার্ড' প্রদানের মাধ্যমে সরকারি সেবার আওতায় আনা জরুরী । শস্য তোলার পরবর্তী কর্মকান্ড বীজ সংরক্ষন, নার্সারী ব্যবসা, পাটের আঁশ ছাড়ানো, সবজি উৎপাদন, গৃহাঙ্গন কৃষি, ফুলের চাষ, ফল-ফুল ও সবজি উৎপাদন স্থানীয় কৃষিজ পণ্যভিত্তিক কুটির শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা প্রভৃতি কাজে নারীর যোগ্যতা ও পরিশ্রমকে মর্যাদা দিতে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা ও মূলধনী সহায়তা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এতে কৃষিজীবি নারী তথা কিষাণীদের সামাজিক নিরাপর্ত্তা জালের আওতা বৃদ্ধি পাবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থনীতির সকল সেক্টরেই বর্তমানে নারীর অবদানকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। তাই কৃষি খাতকে আরো শক্তিশালী, আধুনিক ও সময়োপযোগী করতে কিষাণী ও নারী কৃষি শ্রমিকদের গুরুত্ব দিতেই হবে।

দেশের কৃষি এবং কিষাণ-কিষাণীর সামগ্রিক উন্নয়নের প্রয়োজনে 'সামগ্রিক কৃষি সংস্কার কর্মসূচী' গ্রহন করে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি দ্রুত গ্রহণ করা বাঞ্চনীয় ।

১ । কৃষিখাতের সংগে যুক্ত উৎপাদক গ্রামীন নারীদেরকে কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং কৃষক হিসেবে তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে ।

২ । কৃষিখাতে সকল সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন পর্যায়ে বর্ধিত করে নারীদের অংশগ্রহনকে উৎসাহিত করতে হবে ।

৩ । জমিতে পরিবারের নারী সদস্যদের অধিকার ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে । এ জন্য হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের বৈষম্যমূলক ধারাগুলো সংশোধন করে জমিতে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে ।

৪ । কৃষিভিত্তিক ব্যবসায়ে পরিবারের নারী সদস্যদেরও যাতে প্রবেশাধিকার থাকে সে জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে ।

৫ । ফসল তোলার পরবর্তী কর্মকান্ড, বীজ সংরক্ষণ, নার্সারি ব্যবসা, পাটের আঁশ ছাড়ানো, সবজি উৎপাদন, গৃহাঙ্গনে কৃষি, ফুলের চাষ, ফল-ফুল ও সবজি বীজ উৎপাদন, স্থানীয় কৃষিজ পন্যভিত্তিক কুটির শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা প্রভৃতি কাজে নারীর আগ্রহ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা ও মুলধনী সহায়তা প্রদান করতে হবে ।

৬ । নারী-পুরুষ উভয়কেই সমান কাজে সমান মজুরী দিতে হবে ।

৭ । কৃষিকাজ অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে নারীদের ব্যবহার উপযোগী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের জন্য বিভিন্ন গবেষনা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করতে হবে । পাশাপাশি উদ্ভাবিত যন্ত্র মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারনের জন্য কৃষি অধিদপ্তরকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে ।

৮ । কৃষিতে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করণের জন্যে যথাযথ গবেষনা কার্যক্রম গ্রহন করে অসুবিধাসমূহ দূরীকরনের ব্যবস্থা করতে হবে ।

৯ । গ্রামীন নারী শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার রক্ষায় প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিতে হবে ।

১০ । নারী কৃষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদের উপযোগী নিয়মিত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে ।

১১ । বাজারে নারীদের জন্য আলাদা স্থান সংরক্ষিত রাখতে হবে ।

১২ । নারী কৃষক এবং নারী কৃষি শ্রমিকদের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করতে হবে, সরকারকে এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে ।

১৩ । গ্রামীন নারীদের কাছে কৃষি তথ্য পৌছে দেবার বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে ।

উপসংহার ঃ

পরিশেষে বলা যায়, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অংশগ্রহন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নারীর অবস্থান এখনো যথেষ্ট নাজুক। দেশে নারীদের গৃহস্থালির কাজের অর্থমূল্য হিসাব করা হয় না বলে অর্থনীতিতে নারীর অবদান আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সি পি ডি) গবেষণাপত্র বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নারীরা দৈনিক গড়ে ১৬ ঘন্টা গৃহস্থালির কাজ করে। তারা সব মিলিয়ে প্রতি বছর ৭৭ কোটি ১৬ ঘন্টা কাজ করে। যার অর্থ মূল্য হয় ৬ হাজার ১০৩ কোটি ডলার। এই অর্থ জি ডি পি-তে যুক্ত হলে 'জি ডি পি-র' আকার দ্বিগুনেরও বেশি হতো। বাংলাদেশে একজন পুরুষ যে কাজ করে তার ৯৮ শতাংশই জি ডি পি-তে যুক্ত করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে নারীর কাজের মাত্র ৪৭ শতাংশ জি ডি পি-তে যুক্ত হচ্ছে। কৃষি অর্থনীতিসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্মকান্ডে অনেক ক্ষেত্রেই নারী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তারপরও নারীর শিক্ষা, প্রশিক্ষন, মাতৃত্বকালীন পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা প্রদান, আইনগত ও নাগরিক অধিকার প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রণোদনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর সুষম অংশগ্রহন নিশ্চিত হবে না। অর্থনীতিতে নারীদের সম্পূর্ন অন্তর্ভূক্তির মুখে বিদ্যমান অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারলে এক সময় সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি হবে নারী।

প্রফেসর হাসিনা বানু
অধ্যক্ষ
সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ
ফরিদপুর

<u>তথ্য সূত্রঃ</u>

১। মানুষের ইতিহাস (প্রচীন যুগ) আব্দুল হালিম ও নূরুন নাহার বেগম।

২। উন্নয়ন (কৃষিতে নারীর স্বীকৃতি কবে?-) আলতাব হোসেন।

৩। কৃষিতে রাষ্ট্রীয় ক্রমবর্ধমান প্রণোদনার সুবিধা কিষাণী বান্ধব করা প্রয়োজন- শরমিন্দ নীলোর্মি ও আহসান উদ্দিন আহম্মেদ।

৪। জাতীয় কৃষি কনভেনশন-২০০৮।

৫। দৈনিক 'প্রথম আলো।'